বাঙালির কালীপূজা

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কালীপূজা বাঙালির একটি মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্য। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী এই তিন দেবীর পূজা বাঙালি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কালীর পূজা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কালী বাঙালির অতিপ্রিয় দেবতা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বাঙালি এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কার্তিক মাসের অমাবস্যার দেওয়ালির দিন যে পূজা হয় তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রসিদ্ধ। ইহার নাম দীপান্বিতা কালীপূজা। রটন্তী চতুর্দশী বা মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রিতে অনেকে রটন্তী কালীপূজার অনুষ্ঠান করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় বিবিধ ফলমূলাদির সাহায্যে ফলহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহাদি শুভকর্ম উপলক্ষে কেহ কেহ কালীপূজা করিয়া থাকেন। কোনও রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে শান্তি কামনায় রক্ষাকালীর পূজা করার প্রথা কিছুদিন পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে দেখা যাইত। সাধারণত কালীকে ওলাউঠার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিলেই কালীপূজার আয়োজন করা হইত। * অনেক স্থানে নির্দিষ্ট দিন বা বছরের যে কোনও দিনে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক পূজার ব্যবস্থা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত শনি ও মঙ্গলবার, অমাবস্যা তিথি এবং নিশীথ রাত্রিতে কালী বা যে কোনও শক্তি

---

* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-ভারতের কোনও কোনও গ্রামেও কালী ওলাউঠার ত্রাণকারিণী, ভূত-প্রেত, বন্যজন্তুর আক্রমণে রক্ষাকর্ত্রী, বহিরাগত অমঙ্গল হইতে গ্রামের রক্ষাবিধাত্রী এবং বিহঙ্গ-নাশক ব্যাধকুলের পরম শ্রদ্ধাভাজন।

দেবতার পূজার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত।

বাংলার নানা স্থানে অগণিত কালীমন্দির, কালীবাড়ি বা কালীতলা প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক স্থলে প্রস্তর বা মৃত্তিকার কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কোনও কোনও মন্দির পঞ্চমুণ্ডের উপর স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোনও কোনও স্থানে নানা সময়ে মূর্তি তৈয়ারি করিয়া পূজা করা হয়। বাংলাদেশের নানা স্থানে নানা নামে এই দেবতা পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে ইঁহার নাম। যথা—ঢাকেশ্বরী, যশোরেশ্বরী প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বরী, করুণাময়ী, আনন্দময়ী প্রভৃতি নামেও ইনি বহু স্থলে পরিচিত। এই সমস্ত নামের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। গত শতাব্দীর সংবাদপত্রে উল্লিখিত কলিকাতার বাগবাজার, হুগলির অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেব প্রণীত 'এ ভিউ অব দি হিস্টরি—লিটরেচর অ্যাণ্ড রিলিজন অব দি হিণ্ডুজ' (২য় খণ্ড, শ্রীরামপুর, ১৮১৫) গ্রন্থেও সিদ্ধেশ্বরী ও করুণাময়ীর বিবরণ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিমতলার আনন্দময়ী প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, অন্যান্য যে সমস্ত স্থানের কালী প্রসিদ্ধ তাহাদের মধ্যে কালীঘাটের কালী সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিস্থান মেহার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধিস্থান দক্ষিণেশ্বর ও বরিশালের অন্তর্গত পোনাবালিয়া গ্রামের কালীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন অংশে বাঙালি যে সব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অনেক স্থানে সে কালীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন শাক্তপ্রধান বাংলাদেশে কালীর উপাসক-সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি—অধিকাংশ বাঙালি শাক্তই কালীমন্ত্রে দীক্ষিত। অন্যান্য শাক্ত দেবতার পূজা-উৎসব অনেক স্থলে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির উপরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র মূর্তি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না। তাই দুর্গাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি বাংলার প্রসিদ্ধ উৎসবের সময় প্রতি কালীমন্দিরে উৎসবের ঘটা পড়িয়া যায়। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে কালীর যে রূপ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসববহুল বিশেষ পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তারা প্রভৃতি মূর্তির সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ওই সব উৎসবের দিনে অন্যান্য দেবতার উপাসকেরাও কালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

দেবতা হিসাবে কালী অবাঙালিদের মধ্যেও অপরিচিত নন। মিথিলা বা উত্তর-বিহারে বাংলার মতোই কালীমূর্তি ও কালীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালেও কালীর বিশেষ করিয়া গুহ্যকালীর পূজার প্রচলন আছে। দক্ষিণ ভারতের কেরলে কালীপূজার বহুল প্রচলন আছে। কিছুদিন পূর্বে কেরলে কালীপূজা সম্পর্কে মালয়ালম ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে পূর্ব ভারত ছাড়া অন্যত্র অবাঙালিদের মধ্যে যে কালী পরিচিত তিনি বাঙালিদের কালীর মতো নহেন। শক্তির মহিষমর্দিনী প্রভৃতি রূপ নানা স্থানে কালী নামে বিখ্যাত ও পূজিত। কালীর শান্ত ও উগ্র রূপের বর্ণনা নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাও তাঁহার হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই দুই রূপেরই বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক গ্রন্থে বর্ণিত ভদ্রকালীর রূপ সুন্দর

ও শান্ত—কারণাগম, চণ্ডীকল্প ও ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত মহাকালী বা কালী উগ্ররূপা। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর একটি প্রস্তরলিপিতে কালীর ভীষণ আকৃতির উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে কালীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দেবীর ভয়ানক মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বর্ণনানুসারে দেবী করালবদনা অসিপাশধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা ব্যাঘ্রচর্মবসনা শুষ্কমাংসা অতিভীষণা অতিবিস্তৃতমুখী লোলজিহ্বা আরক্ত কোটরগত নয়নবিশিষ্টা। ইঁহার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। ইনি চণ্ডমুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়া চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা হন। ইঁহার ধ্বংসলীলার কাহিনি দেবীমাহাত্ম্যের বিভিন্ন অংশে কীর্তিত হইয়াছে।

আমরা বাংলাদেশে যে কালীমূর্তির পূজা করিয়া থাকি তাহার সহিত এই সমস্ত বর্ণনার মিল নাই। বাংলাদেশে এই মূর্তি বিশেষ পরিচিত—বাংলাদেশে প্রচলিত গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে, **তন্ত্রসার** রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই মূর্তি প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয় না—আগমবাগীশের পূর্ববর্তী গ্রন্থেও এই মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে হইতে পারে—এ মূর্তির কোনও নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বীয় সংগ্রহশালায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে একখানি অর্বাচীন লৌহমূর্তি আছে—ইহা সঙ্গে লইয়া অনায়াসে চলাফেরা করা যায়। বলা হয়, এইরূপ মূর্তি চোর-ডাকাতদের সঙ্গে থাকিত—তাহারা পথে-ঘাটে ইহার পূজা করিত এবং দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইত।

বাংলাদেশে পূজিত কালীমূর্তির বহু প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ মূর্তি ভয়ানক—অবশ্য এখানে-সেখানে কিছু কিছু কমনীয়তার আভাসও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত বাঙালি কালীর যে রূপের পূজা করিয়া থাকে তাহার নাম **দক্ষিণা কালী**। ইঁহার বর্ণনা পাওয়া যায় **কালীতন্ত্র** নামক মূল তন্ত্রগ্রন্থে (১/২৭—৩৩)। এই বর্ণনা বা ধ্যান পূজায় ব্যবহৃত হয় এবং ইহা সুপরিচিত। এই ধ্যানানুসারে দেবী করালবদনা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালাবিভূষিতা মহামেঘপ্রভা শ্যামা দিগম্বরী ঘোরদংষ্ট্রা পীনোন্নত-পয়োধরা শ্মশানবাসিনী শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা। তাঁহার বাম দুই করে সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ—দক্ষিণ দুই করে বরাভয়। কণ্ঠস্থিত মুণ্ড সমূহ হইতে গলিত রক্তে তাঁহার সর্বদেহ চর্চিত। দুইটি শব তাঁহার কর্ণভূষণ—সুতরাং আকৃতি ভয়ানক। শবের কর সমূহ দ্বারা তাঁহার কাঞ্চী রচিত। তাঁহার ওষ্ঠাধরের প্রান্ত ভাগ হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে। বালার্কমণ্ডলের মতো তাঁহার তিন লোচন। ঘোররাবী শিবা সমূহের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। মুখ তাঁহার প্রসন্ন পদ্মতুল্য এবং হাস্যপূর্ণ। আশ্চর্যের বিষয়, এই ধ্যানের সঙ্গেও আমাদের কালীমূর্তির পূর্ণ মিল নাই। এই দেবীর নাম দক্ষিণা বা উদারা—কারণ ইনি সাধকের স্বল্প সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন।

তন্ত্রসার ও **শ্যামারহস্য** গ্রন্থে দেবীর পূজার নানা মন্ত্র ও ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্যানগুলির মধ্যে বর্ণনীয় দেবতার রূপের পার্থক্য খুব বেশি নাই, শব্দের পার্থক্য অবশ্যই

আছে। ধ্যানগুলি কোনও কোনও মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা সর্বত্র উল্লিখিত হয় নাই। একটি ধ্যান কালীতন্ত্রে আছে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর দুইটি ধ্যানের আকর যথাক্রমে **স্বতন্ত্র তন্ত্র ও সিদ্ধেশ্বরতন্ত্র**। তবে এই দুই তন্ত্রের কোনোখানিই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্যামারহস্যে উদ্ধৃত একটি ধ্যানে (৬/৫) দেবীকে উপবিষ্টারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—অপর একটি ধ্যানে (১৫/২২) দেবী নরকপালারূঢ় রক্তবসনোজ্জ্বলা। একটি ধ্যানে দেবীকে মদ্যপানপ্রমত্তা বলা হইয়াছে। অপর একটি ধ্যানানুসারে দেবী নাগরূপ যজ্ঞোপবীতধারিণী। একটি ধ্যানে দেবী কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা এবং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা—দেবীর বাম পদ শবহৃদয়ে এবং দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত। একটি ধ্যানে দেবীর মাথায় জটার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা ও পূজা প্রণালী বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কালীতন্ত্রে (১০/৩৩) সিদ্ধকালীর যে ধ্যান দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে দেবী ত্রিনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরী—নীলোৎপলবর্ণা দীপ্তজিহ্বা। দেবী আলীঢ়পদা অর্থাৎ তাঁহার বামপদ অগ্রে স্থাপিত। খড়্গদ্বারা বিদারিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্ষরিত অমৃতরসে তাঁহার দেহ প্লাবিত। তিনি বামহস্তে স্থিত কপাল হইতে গলিত অমৃত পান করিতেছেন। মণিময় মুকুটাদি অলঙ্কারে তিনি শোভিতা। এই ধ্যান **শ্যামারহস্য** (৬/১৫) ও **তন্ত্রসারেও** উল্লখিত হইয়াছে। সেখানে দেবতার কোনও স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয় নাই।

গুহ্যকালী মহামেঘবর্ণা কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা লোলজিহ্বা ঘোরদংষ্ট্রা কোটরাক্ষী সহাস্যবদনা। নাগময় তাঁহার যজ্ঞোপবীত, নাগময় তাঁহার হার এবং নাগশয্যায় তিনি সমাসীন। তাঁহার মস্তকে আকাশস্পর্শী জটাজাল। তাঁহার গলায় পঞ্চাশ নরমুণ্ডের বনমালা। তাঁহার উদর বিশাল। সহস্র ফণাযুক্ত অনন্ত তাঁহার মস্তকে—তিনি চতুর্দিকে নাগফণার দ্বারা বেষ্টিত। সর্পরাজ তক্ষক তাঁহার বামকঙ্কণ—নাগরাজ অনন্ত তাঁহার দক্ষিণ কঙ্কণ। নাগের দ্বারা তাঁহার মেখলা রচিত। তাঁহার কর্ণে নরদেহ গঠিত কুণ্ডল। পায়ে তাঁহার রত্ননূপুর। বামে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস। দেবী দ্বিভুজা প্রসন্নবদনা সৌম্যা অথচ ভীমা অট্টহাস্যকারিণী নবরত্নবিভূষিতা শিবমোহিনী। নারদাদি মুনিগণ তাঁহার সেবা করেন। তন্ত্রসারে ইঁহার বর্ণনা আছে। ভদ্রকালী ক্ষুধায় কৃশাঙ্গী মুক্তকেশী। তাঁহার চক্ষু কোটরগত, মুখ সমীমলিন, দন্ত জম্বুফল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ। তিনি এই বলিয়া রোদন করেন, 'আমি তৃপ্ত নই—আমি সমগ্র জগৎ এক গ্রাসে ভক্ষণ করিব।' তাঁহার দুই হাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখাতুল্য পাশযুগল। এই দেবীর পূজা করিলে শত্রুবিনাশ হয়। তন্ত্রসারে ইঁহার কথা আছে।

শ্মশানে নগ্ন অবস্থায় শ্মশানকালীর পূজা করণীয়। গৃহস্থের পক্ষে গৃহেও পূজা করিবার বিধান আছে—কিন্তু সেরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই। সাধারণত নিঃসন্তান বা অপুত্রক ব্যক্তিরাই পূর্বে এই পূজা করিতেন। দেবী অঞ্জনাদ্রিতুল্য ঘনকৃষ্ণবর্ণা শ্মশানবাসিনী রক্তনেত্রা মুক্তকেশী শুষ্কমাংসা অতিভীষণা পিঙ্গাক্ষী। দেবীর বামহস্তে মদ্যপূর্ণ মাংসযুক্ত পাত্র—দক্ষিণহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। দেবী স্মিতবদনা এবং সর্বদা আসবমত্তা। তন্ত্রসার ও

শ্যামারহস্যে (৬/২১-২২) ইঁহার বিবরণ আছে।

রক্ষাকালীর নাম তন্ত্রসারে নাই। তবে যে ধ্যানে তাঁহার পূজা হয় তাহা তন্ত্রসারে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা। দেবীর দক্ষিণ দুই হস্তে খড়্গ ও পদ্মযুগল—বাম দুই হস্তে কর্তৃকা ও খর্পর। দেবীর মস্তকে দুইটি জটা—একটি গগনস্পর্শী। ইঁহার মস্তকে ও গ্রীবায় মুণ্ডমালা। ইঁহার বক্ষে নাগহার—লোচন রক্তবর্ণ। দেবীর কটিতে কৃষ্ণবস্ত্র—তিনি ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা। তিনি বামপাদ শবহৃদয়ে সন্থাপন করিয়া দক্ষিণপাদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন। দেবী মদ্যপানরতা অট্টহাস্যযুক্ত ভীষণাকৃতি। তিনি ঘোর গর্জন করিয়া থাকেন।

দেবীর চামুণ্ডারূপের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। দুর্গাপূজায় সন্ধিপূজার সময় ইঁহার পূজা করা হয়।

দেবীর এই বিভিন্ন রূপের পূজার মধ্য খুঁটিনাটি নানা পার্থক্য আছে। প্রত্যেক রূপে পূজার মন্ত্র আলাদা। যিনি যে মন্ত্র দীক্ষাগ্রহণ করেন সাধারণত সেই মন্ত্রানুসারে তাঁহার নির্দিষ্ট রূপের পূজা করার কথা—বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্য রূপের পূজাও কখনও কখনও চলিতে পারে। পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে পূজা উপলক্ষে প্রচুর আড়ম্বর ও অর্থব্যয় হইত—মাঝে মাঝে নরবলিও হইত, এরূপ শুনা যায়। কালীঘাটে কালীর সম্মুখে একজন নিজের জিহ্বা বলি দিয়াছিল—এই সংবাদ ১৮২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখের **সমাচার-দর্পণ** পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ওই পত্রিকায় ১৮২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় কালীঘাটের কালী মাতার এক আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়বহুল পূজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ গোপীমোহন ঠাকুর বহু স্বর্ণালঙ্কার ও বিবিধ উপকরণের সাহায্যে এই পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব দেবীকে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়াছিলেন। ওআর্ভের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায় নবকৃষ্ণ কালীঘাটের কালীমন্দিরে পুজোপলক্ষে একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন আর খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল ব্যয় করিয়াছিলেন পঁচিশ হাজার টাকা। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র রায় দীপান্বিতা কালীপূজা উপলক্ষে কখনও কখনও হাজার হাজার মণ মিষ্ট, হাজার হাজার শাড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করিতেন। ইহা ছাড়া, অন্যান্য খরচ বাবদেও তাঁহার প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র দীপান্বিতা কালীপূজা প্রচারের জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র হুকুম দিয়াছিলেন—তাঁহার প্রত্যেক প্রজাকে এই পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যথা গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। এই নির্দেশের ফলে নদিয়া জেলায় প্রতি বৎসর দেওয়ালি উপলক্ষ্যে দশ হাজার কালী পূজা হইত। মনে হয় দীপান্বিতা কালীপূজার প্রচলন সে সময় তেমন ছিল না। তাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই চেষ্টা। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ১৭৭৭ সালে রচিত তাঁহার **শ্যামাসপর্যাবিধি** গ্রন্থে যেভাবে নানা প্রমাণ সহযোগে কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

তাহাতে মনে হয়, তিনিও বহু প্রচলিত ওই উৎসবের প্রচার কামনায় ইহার গৌরব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার প্রাচীনতা যাহাই হউক না কেন, দীপান্বিতা কালীপূজা আজ বাংলাদেশে একটা মস্ত বড়ো উৎসবে পরিণত হইয়াছে—বাংলার বাইরের দেওয়ালি ও বাংলার কালীপূজা এই দুইয়ের সমন্বয়ে এই উৎসব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রটন্তী চতুর্দশীর পূজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থে আছে সত্য কিন্তু বর্তমানে ইহার তেমন প্রচলন নাই। পূজার প্রচলন যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে কালীপূজার সে গাম্ভীর্য নাই—ইহা একটা হালকা উৎসবে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে কালীপূজা লোকের মনে যে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করিত—এই পূজার অনুষ্ঠান অতি কঠিন বলিয়া লোকের মনে যে ধারণা ছিল—ইহার অনুষ্ঠানে সে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বিত হইত—ইঁহার মধ্যে যে গভীর সাধন রহস্য রহিয়াছে—এখন তাহা বুঝা বা বুঝানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পক্ষান্তরে, কালীপূজার অঙ্গ হিসাবে আমরা যে সকল আপাতত বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের কথা শুনিতে পাই ও শুনিয়া আতঙ্কিত হই, সেগুলি অবাস্তব না হইলেও পূজার মুখ্য বা অপরিহার্য অঙ্গ নহে—সেগুলি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সত্য বটে, অশাস্ত্রীয় বিকৃত আচরণ অনেক স্থলে পূজানুষ্ঠানকে কলুষিত ও ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছে। তবে একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহার অন্তরালে যে মহনীয়তা বর্তমান রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িবে।

শ্রীশ্রীকালী

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোনও কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; যখন তিনি এই সব কার্য করেন—তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ। ...তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা—নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী; গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব-শিবা-ডাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নবহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন।...সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মাসিক বসুমতী, কার্তিক- চৈত্র, ১৩৬৪